সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৫ ॥ সংখ্যা : ৩ ॥ জুন ২০১৮

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ-র কবিতায় পরিবর্তনের ধারা

সঞ্জয় বিক্রম*

সারসংক্ষেপ : রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ-র কবিতায় দুটি ধারা লক্ষ করা যায়। একদিকে তিনি স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশের অস্থিতিশীল রাজনীতিসৃষ্ট সমাজ ও জনজীবনের চিত্র এঁকেছেন, অপরদিকে আত্মগত প্রেমানুভূতির কথা প্রকাশ করেছেন। প্রথম ধারার কবিতায় সাধারণ মানুষের মুক্তির প্রত্যাশায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, অন্য ধারায় ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির কথা বলেছেন। এই দুই ক্ষেত্রেই প্রথম দিকের উপলব্ধি শেষ দিকে এসে বদলে গেছে অনেকখানি। বদলে গেছে কণ্ঠস্বরও। শুরুর দিকের উচ্চকণ্ঠ শেষ দিকে এসে নমনীয় হয়ে গেছে। প্রথম দিকে গ্রামীণ জীবনের প্রতি যে মমতা লক্ষ করা গেছে, শেষ দিকে এসে তা ধীরে ধীরে নাগরিক অনুষঙ্গ দ্বারা অপসারিত হয়েছে। এই বদলটি ঘটেছে ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবর্তের অভিঘাতে।

স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে কবিতা লেখা সত্তরের কবিদের মধ্যে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬–১৯৯১) অন্যতম। সত্তরের কবিরা বাংলা কবিতার আসরে প্রচলিত কাব্যস্বরেরই সমৃদ্ধিসাধন করেছেন।[১] কবি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং এ-নিয়ে তাঁকে কোন হীনম্মন্যতায় ভুগতে দেখা যায় না।[২] তবে বাংলা কবিতার ধারাটিকে একটি বিশেষ আদর্শে প্রবাহিত করার বাসনা তাঁর মধ্যেও ক্রিয়াশীল ছিল। বাঙালি ঐতিহ্যের মূল ধারাকে আঁকড়ে ধরেই তিনি বাংলা কবিতার ভুবনটিকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাঁর কাব্যজীবন এক যুগ বা তার কিছু বেশি। প্রকাশিত কাব্য সংখ্যা আট। এছাড়াও আছে অগ্রন্থিত, পববর্তীকালে প্রকাশিত প্রচুর কবিতা। কাব্যগুলোতে কবির আদর্শগত প্রবণতা অভিন্ন ছিল। এই অভিন্নতার মধ্যেই ক্রমান্বয়ে বদল ঘটে বোধের। লক্ষ করা যায় যে, সময়ের অভিঘাতে পূর্বাপর লেখা কবিতায় বিশ্বাসের বদল ঘটে গেছে। কীভাবে এই বদলটি সংঘটিত হয়, কবিতার আলোচনায় তা-ই দেখানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহকে বোঝার জন্য এই ক্রম পরিবর্তনের ধারা অনুধাবন জরুরি। এখানে তাঁর কাব্যের মূল দুটি বিষয় ধরে পরিবর্তনের স্বরূপ উন্মোচনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনা প্রকাশিত আটটি কাব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

---

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i3.11

এক.

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর প্রকাশিত কাব্যগুলো হলো– *উপদ্রুত উপকূল* (১৯৭৯), *ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম* (১৯৮১), *মানুষের মানচিত্র* (১৯৮৫), *ছোবল* (১৯৮৬), *গল্প* (১৯৮৭), *দিয়েছিলে সকল আকাশ* (১৯৮৮), *মৌলিক মুখোশ* (১৯৯০) ও *এক গ্লাস অন্ধকার* (১৯৯২)। কাব্যগুলোতে কবির দুটি প্রবণতা বিশেষভাবে নজরে আসে। এক, সমকালীন অশান্ত রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা; দুই, আত্মমগ্ন প্রেমানুভূতির প্রকাশ।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর মানসগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল ষাটের দশকে উদ্ভূত 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'। ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান থেকে তিনি রাজনীতিসম্পৃক্ত হয়ে উঠেছিলেন। স্বাধীনতার পর থেকেই তিনি ঢাকার অধিবাসী। সেই সময়ের রাজনীতিক অস্থিতিশীলতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। দেখেছেন এই পরিস্থিতিপ্রসূত সামাজিক অবক্ষয় ও অব্যবস্থাপনা। আদর্শ ভুলে স্বার্থের হাটে মানুষ কীভাবে বিক্রি হয়ে যায়, দেখেছেন তার অজস্র নমুনা। নিজে অর্থকষ্টে ভুগেছেন, পরিচিতজনদের কাছে অবজ্ঞা কুড়িয়েছেন, প্রেমে-বিরহে জারিত হয়েছেন। এই সবকিছু তাঁর বিশ্বাসকে, বোধকে বদলে দিয়েছে একটু একটু করে।

বাংলার রাজনীতিতে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা কলঙ্কিত ঘটনাটি ঘটে ৭৫-এর ১৫ আগস্ট। তারপর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশ স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি কিংবা সেনাশাসকের হাতে জিম্মি ছিল। সত্তরের দশকের কবিদের চেতনায় এই রাজনীতিক সংকটের প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রবল।

> এক অর্থে সত্তরের কবিদের অতিক্রম করতে হয়েছে একটি প্রবল অস্থির, জঙ্গমময়, অনিশ্চিত সময়ের মধ্যে। কবিদের কলমের বদলে তুলে নিতে হয়েছে অস্ত্র। স্বাধীনতার মুক্তি-সংগ্রামের উত্তাপে এ-সময়ের কবিরা স্বভাবতই, আবাসচ্যুত, সাহিত্য-নিবিষ্টতার বদলে গণ-সম্পৃক্ত রণাঙ্গণের সৈনিক। (বায়তুল্লাহ্, ২০১৮ : ১৭৬)

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর সমগ্র কাব্যজীবন বাংলাদেশের এই কালপর্বে সীমাবদ্ধ থেকেছে। ১৯৯১ সালে অকালে প্রয়াত হওয়ার আগে তিনি এই সময়ের রাজনীতিপ্রভাবিত সমাজবাস্তবতার কথা লিখেছেন তাঁর কবিতায়; লিখেছেন সে সময়ের মানুষের অসহায়ত্বের কথা, সুবিধাবাদী নীতিহীন রাজনীতিকের কথা। নিজের প্রতিবাদকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন, সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন আমজনতাকে। তিনি 'প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তাঁর মতাদর্শ ছিল সাম্যবাদী' (তপন, ১৯৯৮ : ১২৭)। পাশাপাশি লিখেছেন ব্যক্তিগত প্রত্যাশা-অপ্রাপ্তি-ভালোবাসার কথা।

দুই.

রাজনীতি ও সমাজসম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতার বক্তব্য ও বক্তব্যের ধরন বিবেচনা করা যাক। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য *উপদ্রুত উপকূল* (১৯৭৯)। 'বাতাশে লাশের গন্ধ' শুঁকে 'ধর্ষিতা বোনের শাড়ি'কে 'জাতির পতাকা'

বানিয়ে প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলা কবিতায় রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ আবির্ভূত হলেন। এসেই নিজের পরিচয় দিলেন 'শব্দ-শ্রমিক' বলে। মানুষের 'ভুল বোধে ভুল চেতনায়' 'শব্দের লাল হাতুড়ি' পেটানোকে নিজের কাজ বলে উপস্থাপন করলেন। নিজেকে দাবি করলেন 'ভাষা-সৈনিক' বলে–

ভাষা-সৈনিক আমি জানি শুধু যুদ্ধ,
আমার সমুখে আলোর দরোজা রুদ্ধ–
তাই বারুদে সাজাই কোমল বর্ণমালা,
তাই শব্দে শাণিত আনবিক বিষ-জ্বালা।
ধূর্জটি-জটা পেতে রোধ করি অবক্ষয়ের সংশয়,
আমার এ-হাতে শব্দ-কাস্তে ঝলসায়।
('শব্দ-শ্রমিক', *উপদ্রুত উপকূল*)

তিনি শুরুতেই নিজের প্রতিপক্ষকে ভালোভাবেই চিনে নিয়েছেন। পঁচাশি ও পনের ভাগের মধ্যে তাঁর পক্ষপাত বেশির দিকে। তিনি জানেন, পঁচাশি ভাগের মানুষকে 'কারা ধুতুরার ফুলে অন্ধ করেছে অবেলায়'। এবার তাই 'বুকের ভাষাকে' 'রণের সজ্জায়' সাজিয়ে পঁচাশি ভাগ মানুষের লোহু মজ্জায় 'শব্দ-প্রেরণা' বুনে দিতে চান। 'রুদ্র এমনিতর দায়বদ্ধ কবিদের একজন, যার কবিতার চরিত্র সুপ্ত বা উপ্ত উভয়ভাবেই, শুধু প্রতিবাদের ভাষাই নয়, লড়াইয়ের ধাতব স্পন্দনে অনুরণিত (আহমদ, ২০১৫ : ৩০৯)। মানুষের বোধে প্রেরণা বুনে দিতে তাদের গালাগালি করতেও ছাড়েন না তিনি –

আগুন লেগেছে পালা –
শালা সব শুয়োরের জাত, কুত্তার লেজুর,
ঘর ভরা বীজধান, গর্ভবতী নারী তোর দুধের সন্তান,
সব ফেলে একা-একা পালাবি কোথায়?
('প্রজ্জ্বলন্ত লোকালয়', *উপদ্রুত উপকূল*)

কবি বলেছেন, 'কতিপয় হিজড়া-পণ্ডিত আর মূর্খ নেতাদের ডিনার টেবিলে/ মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে বিষন্ন বাংলাদেশ উচ্ছিষ্ট হাড়ের মতো'। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য আর্ত মানুষকেই জ্বলে উঠতে হবে। তাদের সমন্বিত প্রতিরোধেই বাংলাদেশের অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব বলে তাঁর বিশ্বাস। আর এই অবরুদ্ধ আর্ত মানুষেরা যতদিন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে প্রতিবাদ না করবে, ততদিন তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হবে না। সে কারণেই তাদের আহ্বান করে তিনি বলেন –

হত্যা আর সন্ত্রাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ব্যথিত জীবন,
আজ বড়ো দুঃসময়– ইটের দেয়ালে বন্দি ফুলের চিৎকার
ওই শোনো কাতর কান্নার ধ্বনি ভেসে আসে নিষিদ্ধ বাতাসে।

('সাহস', *উপদ্রুত উপকূল*)

প্রথম কাব্যে মানুষের মধ্যে যে-বোধের সঞ্চার করে দিতে চেয়েছেন– যার ফলে মানুষের জাগরণ ঘটবে বলে আশাবাদ পোষণ করেছেন– এবং এভাবেই মানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসবে বলে বিশ্বাস করেছেন, সেই বোধ তাঁর পরবর্তী কাব্যগুলোতেও ক্রিয়াশীল ছিল। তবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, প্রথম কাব্যের বক্তব্যগুলো অনেক বেশি চড়া কণ্ঠের। অনেকটা মিছিলের শ্লোগানের মতো। তাঁর দ্বিতীয় কাব্য *ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম* (১৯৮১)। এখানেও কবির উচ্চকণ্ঠ বর্তমান। বিষয়ও প্রায় অপরিবর্তিত। তবে এখানে যুক্ত হয়েছে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে ঐতিহ্য থেকে প্রেরণা নেয়ার প্রবণতা। তার সাথে এই কাব্যে গ্রামীণ জীবনের প্রতি কবির মুগ্ধতাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাব্যের নামকরণের মধ্যেও বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তাঁর সোনার গ্রামখানি ফিরে পেতে চেয়েছেন–

শুধু আমি এই কষ্ট আমার মুছে নিতে চাই,
নগরের রুখো গ্রাস থেকে সেই গ্রামখানি মোর
দুধভাত, মিঠে, রূপশালি ধান সেই গ্রামখানি
কেড়ে নিতে চাই, কেড়ে নিতে চাই, কেড়ে নিতে চাই।

('কাঁচের গেলাশে উপচানো মদ', *ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম*)

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি কবির আগ্রহ ছিল বেশ গভীর। তিনি ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে সংগ্রামের প্রেরণা খুঁজেছেন। সাধারণ মানুষকে সংগ্রামী অতীত স্মরণ করিয়ে দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাদেরকে স্মরণ করে দিয়েছেন –

তোমার পিতার হত্যাকারী একজন আর্য
তোমার ভাইকে হত্যা করেছে একজন মোঘল
একজন ইংরেজ তোমার সর্বস্ব লুট করেছে –
তুমি যাচ্ছো, তুমি একা, তুমি দুই হাজার বছর ধ'রে হেঁটে যাচ্ছো।

('মনে করো তাম্রলিপ্তি', *ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম*)

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি কবির নিষ্ঠা এবং গ্রামীণ জীবনের প্রতি প্রবল মমতার বিষয়টি সুনিপুণভাবে কবিতারূপ পেয়েছে *মানুষের মানচিত্র* (১৯৮৫) কাব্যটিতে। অনেকেই এটিকে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর সেরা কীর্তি বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা এ-কাব্যের ছন্দ (বিশ চরণ ও বাইশ মাত্রার সমিল অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। কয়েকটি কবিতা ইচ্ছা করেই অমিল রেখেছেন) ও আঞ্চলিক শব্দের কাব্যিক ব্যবহারের সাফল্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন।[৩] গ্রামীণ মানুষের শত বঞ্চনার, বিশেষ করে গ্রামের সর্বহারা নারীদের বঞ্চনার দলিল *মানুষের মানচিত্র*। দুটি দৃষ্টান্ত দিলেই কবির চিত্রিত মানুষের বঞ্চনা, বেদনা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিবাদের স্বরূপটি বোঝা যাবে–

ক. গেল বছরের দেনা এ-বছর নিয়ে গেল খোরাকির ধান।
এই সনে দেনা হবে আরো, হালের বলদ-গাই যাবে ব্যাঁচা,
কার্তিকের অনটনে সংসারে ডাকবে ঘোর অভাবের প্যাঁচা।
মহাজন ভালো লোক, দেনার বদলে দেবে নাড়ি ধ'রে টান –
(৫, *মানুষের মানচিত্র*)

খ. তোমার জমিনে দেবো এইবার ঘাড়-শক্ত, মানুষের বীজ,
শত আঘাতেও যেন সে মানুষ কিছুতেই না-নোয়ায় ঘাড়।
আমাদের রক্ত, মাংশ পুঁজি কোরে দেবো তারে আমাদের হাড়,
তবু যেন কোনোদিন পরতে না হয় তাকে ভাগ্যের তাবিজ ॥
(৩০, *মানুষের মানচিত্র*)

দ্বিতীয় কাব্যের পর তৃতীয় কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল চার বছর পর। এ-পর্যায়ে এসে কবির কণ্ঠস্বরকে অনেক বেশি সংহত মনে হয়। *মানুষের মানচিত্র* পর্বের কবিতাগুলো পূর্বের কবিতার তুলনায় পরিণত। এই কাব্যের কবিতায় গ্রামীণ জীবন তার দৈনন্দিন উত্তাপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। নাগরিক জীবনের পরিবর্তে গ্রামকেই উপজীব্য করা হয়েছে এই কাব্যে। কেউ কেউ এই প্রবণতাকে 'নব্য জসীমীয়' বলতে চেয়েছেন।[৪] কবি " 'নব্য জসীমিজম' ও বহমান লোককাব্যধারা" শিরোনামে প্রবন্ধ লিখে এ-ধরনের সমালোচনার সমালোচনা করেছেন। *মানুষের মানচিত্র* পর্যায়ে 'জাতিসত্তার মৌলিক স্বরূপ-সন্ধানে এই কবি নৃসত্তা-নদী-নারী-শ্রেণির ইতিহাস-ফসলের মাঠ – সব পরিভ্রমণ করে উত্তরিত হতে চেয়েছেন নাগরিকতায় নয় – প্রাকৃতিকতায়'(বেগম, ২০১৫ : ৩২৪)। কিন্তু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, শেষ দিকে এসে তিনি আর গ্রামীণ প্রকৃতির মধ্যে আবদ্ধ থাকছেন না। ক্রমশ নগরমুখী হয়েছেন। তবে তা আর রাজপথের প্রতিবাদের ভাষানির্ভর শ্লোগান নয়। কবিতায় প্রতিবাদকে ধারণ করেছেন এখান থেকেই। আগে কবির কাছে প্রতিবাদই ছিল মুখ্য। নিজেকে তখন কবি নয়, 'শব্দ-শ্রমিক' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। এই পর্যায়ে তেমনটি লক্ষ করা যায় না। এখান থেকে কবিতাই হয়ে উঠেছে মুখ্য। প্রশ্ন থেকে যায় *ছোবল* (১৯৮৬) কাব্য নিয়ে। এটি *মানুষের মানচিত্র* কাব্যের পরের বছর প্রকাশিত হলেও কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ সনের মধ্যে। বাস্তবে, প্রথম দুই কাব্যের উচ্চকণ্ঠস্বর *ছোবল* কাব্যেই সর্বাপেক্ষা প্রবল। এ কাব্যের 'ইশতেহার' কবিতাকে ইশতেহার বলাই সংহত। কাব্যের কবিতাগুলোর বড় বৈশিষ্ট্যই হলো বক্তব্যধর্মিতা। দুটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক –

ক. জীবন দেখতে যাও টার্মিনালে, খানকি পাড়ায়,
বেশ্যার নাভির নিচে খুঁজে ফেরো শিল্পের আরক –
অথচ সে-জীবনের জন্যে কোনো পক্ষপাত নেই,

সেই কষ্টের বিপক্ষে কোনো বাক্য নেই তোমাদের।

('নপুংশক কবিদের প্রতি', *ছোবল*)

খ. শুধু রক্ত দিয়ে আজ পাল্টানো যাবে না জীবন,
শুধু রক্তে আজ আর কৃষ্ণচুড়া ফুটবে না ডালে।
শুধু মৃত্যু দিয়ে আজ পাল্টানো যাবে না আঁধার,
শুধু রক্তে আজ আর কৃষ্ণচুড়া ফুটবে না দেশে।
অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই, স্বপ্নবান অস্ত্র চাই হাতে ॥

('অস্ত্র চাই', *ছোবল*)

মানুষের মানচিত্র প্রকাশের পরবর্তী কালের কবিতায় চড়া কণ্ঠ আর শোনা যায় না। ১৯৮৫ সনের পূর্বে লেখা কবিতায়ই তা কেবল পরিলক্ষিত হয়। *গল্প* (১৯৮৭) কাব্যের দুএকটি কবিতায় তেমনটি দেখা যায়, যেগুলো ১৯৮৫ সনের পূর্বে লেখা। এর পরবর্তী সমাজ ও রাজনীতিসম্পৃক্ত কাব্য *মৌলিক মুখোশ* (১৯৯০) ও *এক গ্লাস অন্ধকার* (১৯৯২)। এ-পর্বের কবিতায় নাগরিক বাস্তবতা বেশি। এ কাব্যদুটিতে নগর ঢাকার বাস্তবতাই মুখ্য। গ্রামীণ জীবনের প্রতি কবির মুগ্ধতা এখানে দেখা যায় না। শহরের অনুষঙ্গই কবির কবিতার উপকরণ হয়ে এসেছে এখানে। যেমন –

মেথর পট্টির মেয়েগুলো কুয়াশার প্রথম সকালে
দৈনন্দিন ঝাড়ু দিয়ে তুলে নেবে ইটের টুকরোগুলো।
বোমার ধাতব কুচি, আইল্যান্ডের উল্টানো গ্রীল,
পোড়া গাড়ির ভগ্নাংশ
পৌরসভার পোয়াতি ট্রাকে চেপে পৌঁছে যাবে
শহরের প্রান্ত সীমানায়।

('এক্সরে রিপোর্ট', *মৌলিক মুখোশ*)

এখানে লক্ষণীয় যে, কাব্যশরীরে অলংকার সংযোজনেও কবি পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সিদ্ধহস্ত। কবিতায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার প্রবণতা ও বিদ্রোহ থাকলেও তাকে একান্ত কবিতা হিসেবেই পড়া যায়। দুটি নমুনা দেয়া যাক –

ক. মাথাটা বাঁচাও।
মাথার ভেতরে খাঁচা, খাঁচায় সোনালি খরগোশ।
ল্যাম্পপোস্ট ট'লে পড়ছে, পড়ুক, মাতাল সে –
পাঠ্যসূচি প'চে প'চে সার হোক বিদ্যালয়,
তারপর বিদেশি ফুলের চাষে ভ'রে যাবে ঘিলু।

('শীতার্ত সময়', *মৌলিক মুখোশ*)

খ. রাতের দেয়ালে লাল লেখাগুলো মুছে ফেলে যায় কারা!

বুটের ডগায় হাসে স্বদেশের প্রাকৃতিক শ্যামলিমা।
আর দু একটি দলছুট শাদা দিগন্ত-কবুতর
উড়ে যেতে চেয়ে দ্যাখে পায়ে বাঁধা প্রতারক শৃংখল।
('অবচেতনের পথঘাট', *মৌলিক মুখোশ*)

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আর প্রতীকধর্মিতা উপরের দৃষ্টান্তদুটিকে অনন্য কবিতা করে তুলেছে। এই প্রবণতার পেছনে অপরিবর্তনীয় শোষণচক্রের অসীমতায় কবির ক্লান্ত মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। কবির মনের গভীর ক্ষত থেকেই জন্ম হয় বিদ্রূপের। *এক গ্লাস অন্ধকার* (১৯৯২) কাব্যের 'চুটকি' কবিতাটি তার একটি ভালো দৃষ্টান্ত। *এক গ্লাস অন্ধকার* কাব্যে এসে কবির মন যেন একেবারেই ভেঙে গেছে। 'কথা ছিলো, রক্ত-প্লাবনের পর মুক্ত হবে শস্যক্ষেত,/ রাখালেরা পুনর্বার বাঁশিতে আঙুল রেখে/ রাখালিয়া বাজাবে বিশদ'। কিন্তু তা হয় নি। 'কথা ছিলো, আর্য বা মোঘল নয়, এ জমিন অনার্যের হবে।/ অথচ এখনো আদিবাসী পিতাদের শৃংখলিত জীবনের/ ধারাবাহিকতা'। তার উপর ধর্মকে ব্যবসায়ে পরিণত হতে দেখে কবির অন্তর রক্তাক্ত হয়ে গেছে –

ধর্মান্ধের ধর্ম নেই, আছে লোভ, ঘৃন্য চতুরতা,
মানুষের পৃথিবীকে শত খন্ডে বিভক্ত করেছে
তারা টিকিয়ে রেখেছে শ্রেনীভেদ ঈশ্বরের নামে।
ঈশ্বরের নামে তারা অনাচার করেছে জায়েজ।
('ধর্মান্ধের ধর্ম নেই, আছে লোভ, ঘৃন্য চতুরতা', *এক গ্লাস অন্ধকার*)

সবকিছু প্রত্যক্ষ করে কবি নিজেকে মনে করেছেন নিঃসঙ্গ। ভয়ানক শূন্যতায় তিনি যেন একাকি 'এক গ্লাস অন্ধকার হাতে নিয়ে' বসে আছেন। জীবন পরিক্রমায় তিনি শেষ পর্যন্ত একাকিত্বের বোধে উপনীত হয়েছিলেন। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো–

> অন্ধকার নিয়ে লিখেও রুদ্র অন্ধকার ছড়ান না বরং আলোকিত করেন মানুষের ভুবন; কান্না ধ্বনিত হলেও, পাঠকের চোখ ভিজে গেলেও, শেষ পর্যন্ত একটি প্রতিজ্ঞা তাকে নিতে হয়, যে, আর কান্না নয়। (সৈয়দ, ২০১৫ : ৩৩৩)

তিন.

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় সামগ্রিক মানুষ অবশ্যই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু নিজের আত্মমগ্ন অনুভূতি ও প্রেমজনিত বিরহও তাঁকে কাতর করেছে বারবার। এর পেছনে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাপনের প্রভাবটিও গভীর। কবিতার মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাহির এবং ভেতরের টানাপড়েনে তিনি জর্জরিত হয়েছেন। তবে 'আত্মপ্রেমের স্বার্থপর ভূখণ্ড থেকে রুদ্রের কবিমন বারবার হয়েছে সঙ্ঘজীবনমুখী – ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টিই হয়ে উঠেছে তাঁর পরম আশ্রয়স্থল' (রফিকউল্লাহ, ২০০২ :

১৮২)। ব্যক্তিগত জীবনের ঝঞ্ঝাবাত্যায় তিনি শেষাবধি নিজের আদর্শে স্থিত হয়েছেন। এই উত্তরণটি বিবর্তনের ধারায় পরিণতি পেয়েছে। প্রেমানুভূতি নিয়ে লেখা তাঁর কবিতাগুলোর রচনাকাল বিচার করলেই এ-বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে। কবির ব্যক্তিগত জীবনে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর সহধর্মিণীর। বাংলাদেশের আশির দশকে উদীয়মান সমালোচিত এক নারী-কবির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। বৈবাহিক জীবনের স্থিতিকাল ছিল ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর প্রেমানুভূতির ধারণা বদলে গিয়েছিল মূলত তাঁর সহধর্মিণীর অনুরাগে, প্রেমে, মিলনে ও বিরহে। তবে এই নারীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ারও আগের কিছু কবিতায় কোন এক নারীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। হয়তো সেই অজানা নারীই কবির প্রথম প্রেম। তবে তাঁর প্রেমবোধের বিবর্তনে এ বিষয়টি বাধা সৃষ্টি করেনি। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ 'বেদনার পায়ে চুমু খেয়ে' তাকেই জীবন মনে করেছেন, চেয়েছেন 'অভিলাষী মন চন্দ্রে না-পাক, জোস্নায় পাক সামান্য ঠাঁই'। প্রেমের কবিতায় তাঁকে অনেক বেশি কাতর ও রিক্ত মনে হয়। কবিতাগুলোতে আবেগের উচ্ছ্বাসের আধিক্য দেখা যায়। প্রথম দিকের এই উচ্ছ্বাস শেষ দিকে এসে বোধে পরিণত হয়েছে। প্রেমের ব্যাপারে তিনি বিদেহী-ভাববাদী ছিলেন না। আবার শরীরসর্বস্ব প্রেমেও বিশ্বাসী ছিলেন না। শরীর ও মন সমান গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর প্রেমানুভূতিমূলক কবিতায়। প্রথম প্রেমের স্মৃতি স্মরণ করে তাই তিনি বলেন–

সেই থেকে মনে আছে –
কপালের ডান পাশে কালো জন্ম-জরুল,
চুলের গন্ধে নেমে আসা দেবদারু-রাতে
কতোটা বিভোর হতে পারে উদাস আঙুল,
সেই প্রথম অভিজ্ঞতা, সেই প্রথম ভুল।
('অমলিন পরিচয়', *উপদ্রুত উপকূল*)

প্রেমের ক্ষেত্রে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ নরনারীর মুক্ত মেলামেশায় বিশ্বাস করতেন। সামাজিক বন্ধন সেখানে বড় হয়ে আসেনি। তাঁর কাছে গুরুত্ব পেয়েছে পারস্পরিক স্বীকৃতি। তিনি মনে করতেন, দুজনের মনের মিল হলে মিলনে বাধা নেই। কবিতায় যেমন বলেছেন–

নিশিথে নিশির ডাক শুনে যদি শিথিল হয়েছে শাড়ি
তবে আর দ্বিধা কেন?
কাঁকরের রাঙা মাটি অপরূপ শয্যা হবে
চন্দনের ঘ্রান হবে শরীরের উষ্ণতম ঘাম–
ওলো নারী ভয় নেই, চাষের চৌষট্টি কলা আমিও শিখেছি,
আমিও শিখেছি নারী আবাদের মাতৃভাষা সঠিক শৃঙ্গার ॥
('পৌরানিক চাষা', *ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম*)

এর মানে এই নয় যে, তিনি নারীকে কেবল কামজ-বাসনার আধার হিসেবে দেখেছেন। তাঁর কাছে প্রণয়িনী ক্লান্ত পথিকের কাছে বটবৃক্ষের ছায়ার মতো, শ্রান্ত শ্রমিকের গৃহের মতো। নারী তাঁর কাছে প্রশান্তির আধার। মানে, নারীকে তিনি দেখেছেন শ্রান্তিহরা নিশ্চিত আশ্রয় হিসেবে। অন্তত এভাবেই তিনি নারীর প্রেমকে প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই উপলব্ধি করলেন, কেবল দুজনের সম্মতি থাকলেই প্রেম অর্থবহ হয় না। একসঙ্গে সংসার করলেই প্রেম টিকে থাকে না। সাংসারিক জীবনে স্ত্রীর সাথে মতের অমিল দেখা দিয়েছিল খুব তাড়াতাড়িই। ক্রমশ তা বেড়ে গিয়ে ভালোবাসাহীনতাই পরিণত হয়েছিল। তখন ভুল মানুষের প্রতি ভালোবাসার অনুশোচনায় ভুগেছেন তিনি। *গল্প* ও *দিয়েছিলে সকল আকাশ* কাব্যে এই সুর-ই মুখ্য। যেমন –

জানি না গোলাপ ভেবে বিষফুল করবীর স্মৃতি
কখন দিয়েছি তুলে হেমলক-জীবনের ভার,
কখন নিয়েছি টেনে ঘুনে জীর্ন উষর অতীতে–
আজ শুধু শোচনার ম্লান শিখা সেঁজুতি সাজায়।

('অনুতপ্ত অন্ধকার ৩', *গল্প*)

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভালোবাসার জন্য দরকার দুজনের কর্ম ও সাধনার মিল। তা-ছাড়া প্রেম পূর্ণতা পায় না। আর কর্ম ও সাধনায় মিল না হলে একসঙ্গে থাকা কিংবা চলা, মিথ্যা অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর স্বপ্ন মেলানো গেল না। দুজনই ছিলেন কবি এবং নিজের বিশ্বাসে অটল। তাঁদের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই দুজনকে আলাদা দিকে নিয়ে যায়। কবিতায়ও তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় –

সূর্যাস্তের বিকেলে
পাশাপাশি দুজনের মাঝখানে শুয়ে থাকছে একটি সাপ।
দুজনের উচ্ছল হোন্ডার পেছনে ধাওয়া কোরে আসছে
একটি নীল নেকড়ে।
একটি হাত কেবলই দুদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে দুজনের মুখ।
পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমরা ক্রমশ অনুতপ্ত হয়ে পড়ছি।

('জীবন যাপন ২', *গল্প*)

এই ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে পেতে এক সময় স্ত্রীর সাথে কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর বিচ্ছেদ ঘটে যায়। তবে তাঁর পরবর্তী কাব্য *দিয়েছিলে সকল আকাশ*-এ দেখা যায় প্রেমের ব্যর্থতাজাত বেদনার চিত্র। কিছুটা হতাশা কিছুটা আত্ম-অনুশোচনা এ-কাব্যের কবিতার গায়ে লেপ্টে আছে। যেমন –

দিয়েছিলে সম্ভাবনা, দিয়েছিলে প্রথম প্রকাশ,
উড়বার স্বপ্ন শুধু দিয়েছিলে, দাও নাই ডানা।

সমস্ত জীবনটারে তুলে এনে দিয়েছিলে হাতে,
দাও নাই অতি তুচ্ছ নিভৃতের একান্ত ঠিকানা ॥
('দূষিত দুপুর', *দিয়েছিলে সকল আকাশ*)

সহধর্মিণীর সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব মূলত ঘর ও বাহিরের দ্বন্দ্ব। কথা ছিল দুজনই পথের শ্লোগানে গলা মেলাবেন। কিন্তু বিবাহের পর কবিকে ঘরে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টাই[৫] তাঁদের ঘর ভেঙে দেয়। কবির অন্তর রক্তাক্ত হয়েছে বটে, তবু তিনি তাঁর পথকে ছাড়তে রাজি ছিলেন না। প্রথম দিকে 'এখন সময় নয় সঙ্গমের' বলে মানুষকে জাগানোর জন্য যে-আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, সে-আদর্শকে জলাঞ্জলি দেননি। তবে ব্যথিত হৃদয়ে তাঁর অন্তরের কথাটি যেন অতীত প্রিয়ার উদ্দেশ্যেই বলেন –

আমারও ইচ্ছে করে নগরের নিয়ন্ত্রিত পথে
সমস্ত নিষেধ মানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
উড়িয়ে চুলের মেঘ দুইজন
সড়কের মাঝখান বেয়ে হেঁটে যাই –
আমারও ইচ্ছে হয় কাঁদি।
('শোধবোধ', *দিয়েছিলে সকল আকাশ*)

কিন্তু মানুষের সামগ্রিক বোধে স্থিত একজন কবি হয়ে তিনি ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে প্রাধান্য দিতে পারেননি। কেননা কবিতা নিয়ে তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল। নিজেই খোলাখুলি সে কথা লিখেছেন –

> শ্রমিকের মাংশল পেশীর মতো আমার শব্দ আমি মনে করি যে কোনো বিপ্লবের জন্যে অন্তত মুক্তির জন্যে কবিতাই রচনা করতে পারে প্রথম সোপান। আমি তাই অন্য কোনো ব্যবসা না কোরে কবিতা লিখি। কবিতার জন্য, কবিতার জন্য আমি যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। (রুদ্র [ক], ২০১২ : ৩৭৩)

রাজপথকেই তিনি নিজের জগৎ মনে করেছেন। মানুষের মঙ্গল কামনার তাড়না-ই তাঁকে ঘরে আবদ্ধ হতে দেয়নি। অন্তরের ব্যক্তিগত ক্ষতকে তাই পেছনে ফেলে সামনের দিকে চলতে চেয়েছেন। সে কারণেই কবিতায় বলেছেন –

ক্লান্ত দুচোখ, ক্লান্ত চিবুক, ঘুমোও তুমি,
ক্লান্ত গোলাপ সারাটি দিন ঘুমোও তুমি।
আমার এখন ভীষন তাড়া,
বাইরে খরা খাপ খুলেছে তরবারির –
সময় ডাকছে, সময় ডাকছে।
('পরানে চাই দখিন হাওয়া', *দিয়েছিলে সকল আকাশ*)

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ মানুষকে আর কবিতাকে ভালোবেসেছেন। কবিতার মধ্য দিয়ে মানুষকে জাগাতে চেয়েছেন। 'জীবন নিয়ে রুদ্র যতই হেলাফেলা করুক, কবিতা নিয়ে

করেনি; কবিতায় সে সুস্থ ছিল, নিষ্ঠ ছিল, স্বপ্নময় ছিল' (তসলিমা, ১৯৯১ : ২২৪)। কবিতা আর মানুষের মঙ্গলে গভীর আস্থা কবিকে সত্তরের কবিদের মধ্যে অনন্য করে তুলেছে।

> প্রেম ও সুন্দরের প্রতি তাঁর আকণ্ঠ অনুরাগ, দ্রোহ ও সংগ্রামের প্রতি তাঁর অভগ্ন বিশ্বাস এবং সর্বোপরি শিল্পের প্রতি বিশ্বস্ত নিবেদন – তাঁকে করে তুলেছে সত্তরের অন্যান্য কবি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। (মাসুদুল, ২০১৫ : ৪১৪)

চার.

সময়ের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন বলে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায় আবেগ বেশি। সমকালীন জাতীয় আবেগকে সরল ভাষায় কবিতায় ধারণ করতে চেয়েছেন তিনি। 'চাহিদার সঙ্গে নান্দনিক ব্যঞ্জনার একরকম আন্তরিক মেলবন্ধন ঘটানোর ফলে তাঁর কাব্য আধুনিক মাত্রা পেয়েছে' (শহীদ, ২০১৫ : ২৪৩)। 'তাঁর সার্থকতা এই যে, শ্লোগান প্রতিবাদ মুখে থাকলেও কবিতা কখনো শ্লোগান সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। বাঙালির জন্য এই কবি প্রাণের সব শক্তি সাহস ও অনুভব দিয়ে প্রতিবাদ করেছেন' (মোস্তফা, ২০০৮ : ৭৬)। তবে কষ্টার্জিত আঙ্গিকের স্বতন্ত্র কবি হওয়ার বাসনা তাঁর কখনোই ছিল না। তিনি সবসময় চেয়েছেন ভালো কবিতা লিখতে। কিন্তু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, তুলনামূলকভাবে পরের কাব্যগুলোর ভাষায় নমনীয়তা বেশি। *উপদ্রুত উপকূল*-এর 'জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন' কিংবা 'ধর্ষিতা বোনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা' জাতীয় পঙ্‌ক্তি *মানুষের মানচিত্র*তে এসে 'মাতাল, এবার পাতালে চল' ধাঁচের হয়ে গেছে। 'পুরোনো শকুনে'র উপমা ছেড়ে শেষ দিকের কাব্যে এসে 'তামাটে কিশোর', 'হলুদ হরিয়াল', 'রক্তাক্ত কাতরতা' ইত্যাদি বিশেষণকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন তিনি। অলংকার ব্যবহারের দিক দিয়ে তিনি প্রধানত প্রচলিত ধারার অনুসারী ছিলেন। তবে এক্ষেত্রে বক্তব্য ও বিদ্রোহের উপযোগিতা গুরুত্ব পেয়েছে। বক্তব্যের ধরনের সাথে সাথে অলংকার ব্যবহারের ধরন কীভাবে বদলে গেছে, নিচের দৃষ্টান্ত তিনটি লক্ষ করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে –

ক. কতিপয় হিজড়া-পন্ডিত আর মূর্খ নেতাদের ডিনার টেবিলে
মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে বিষন্ন বাংলাদেশ উচ্ছিষ্ট হাড়ের মতো।
('ক্লান্ত ইতিহাস', *উপদ্রুত উপকূল*)

খ. আকাশের নীল কণ্ঠে দুলছে পাখির নেকলেস।
অফিস ফেরত সূর্যটি
দিগন্তের বাসস্ট্যান্ডে একাকি দাঁড়িয়ে আছে,
আঁধারপুরের বাস এখনো আসেনি–
('আঁধারপুরের বাস', *মৌলিক মুখোশ*)

গ. রুগ্নতার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা বিলাচ্ছে অপচয়–

মায়াবী আলোর নিচে চমৎকার হৈ চৈ, নীল রক্ত, নীল ছবি।
('এক গ্লাস অন্ধকার', *এক গ্লাস অন্ধকার*)

অন্যদিকে, বিষয়ের দ্বি-মেরুতা মনে করিয়ে দেয় কাজী নজরুল ইসলামকে (১৮৯৯–১৯৭৬)। এক্ষেত্রে তিনি জাতীয় কবির মতোই প্রেমী ও বিদ্রোহী ছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের কাব্য, বিশেষ করে *উপদ্রুত উপকূল*, *ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম*, *ছোবল*-এর প্রতিবাদের ভাষা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (১৯১৯–২০০৩) *পদাতিক* (১৯৪০) কাব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রভাব থাকা সত্ত্বেও *মানুষের মানচিত্র* কাব্যের লোকজ শব্দের ব্যবহার, সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫–২০১৬) *পরানের গহীন ভিতর* (১৯৮০) কিংবা আল মাহমুদের (জ. ১৯৩৬) *সোনালী কাবিন* (১৯৬৬) কাব্যের লোকভাষা থেকে যে স্বতন্ত্র, সমালোচক তা প্রমাণ করে দিয়েছেন।[৬] এ-ব্যাপারে কবির নিজের স্বীকারোক্তি –

> লোকজ শব্দ ব্যবহার কোরে আঞ্চলিক ক্রিয়াপদ বর্জনের যে-পথ মাহমুদ বেছে নিয়েছিলেন আমার প্রচেষ্টাও তাই ছিল। কিন্তু মাহমুদের কাব্যপ্রচেষ্টার ভেতর নাগরিক লালিত্য ও আভিজাত্য ফুটিয়ে তোলার যে কৃত্রিম প্রবনতা লক্ষ্য করা গেছে, আমি অত্যন্ত সচেতনতভাবে তা পরিহার করার চেষ্টা করেছি। (রুদ্র [খ], ২০১২ : ৩৫৫)

উত্তরকালের কবিদের কবিতায় পূর্বজ কবিদের নির্যাস থাকবে, এটা স্বাভাবিক। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ পূর্বজ কবিদের অভিজ্ঞতা নিয়েছেন নিজের মতো করে। কারো অন্ধ অনুকরণ করেননি। তিনি নিজের মতোই হতে চেয়েছিলেন। তাঁর জন্য নিজস্ব সাধনাটিও বরাবর ক্রিয়াশীল ছিল। *মানুষের মানচিত্র* কাব্যের 'স্বীকারোক্তি' নামক ভূমিকায় বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, তার মধ্যেই আছে এ-কথার প্রমাণ।

> আমার মনে হয়েছে, বাংলাদেশের কবিতায় এক নোতুন বলদীপ্ত তাজা কোমল ভাষার নির্মান হতে চলেছে। প্রচলিত অভিজাত ভাষার ক্রিয়াপদ অক্ষুন্ন রেখে লোকজ শব্দের মিশালের মধ্যেই রয়েছে এই নোতুন ভাষার প্রানশক্তি। (রুদ্র [গ], ২০১২ : ৪৯০)

তবে তিনি অবিকল আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা লেখার পক্ষে ছিলেন না। কেননা এতে করে ভবিষ্যতে 'ব্যাপক সাহিত্যিক অরাজকতার সৃষ্টি হতে পারে'। তিনি চেয়েছেন সকলের বোধগম্য ঐতিহ্যনিষ্ঠ, লোকজ জীবনঘনিষ্ঠ এক সরল কাব্যভাষা সৃষ্টি করতে। আর 'সংক্ষিপ্ত কাব্যজীবনেই রুদ্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন একটি স্বকীয় কবিভাষা। সারল্য, গল্প-ঢং আর লোকভাষাই রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতার প্রধান কাব্যডিকশন' (বিশ্বজিৎ, ২০০৯ : ৯৫)।

পাঁচ.

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ কবিতার মধ্যদিয়ে মানুষকে জাগানোর চেষ্টা করেছেন। কবিতা আর মানুষ – এ দুটিই তাঁর বোধের ও ভালোবাসার কেন্দ্র। ভবিষ্যতের ঐতিহ্যনির্ভর বাংলা কবিতার পথনির্মাণে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল নিরলস। দীর্ঘকাল বেঁচে থাকলে হয়তো এই প্রচেষ্টা একটি স্থির ভিত্তি পেতো। তাঁর কবিতায় ক্রম বিবর্তনের যে ধারা লক্ষ করা যায়, তা থেকে এমন অনুমান করা যেতেই পারে। কেননা রাজনীতিক আদর্শে সমস্ত কাব্যজীবনে অভিন্ন থাকলেও, বিষয় হিসেবে সমাজ আর মানুষই বরাবর প্রাধান্য পেলেও, তাঁর প্রথম দিকের কবিতার বক্তব্যের ধরন শেষ দিকে এসে বদলে গেছে অনেকখানি। গ্রামীণজীবনপ্রীতি ক্রমে বদলে গিয়ে নাগরিক বাস্তবতায় ধাতস্থ হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনে বদলে গেছে প্রেমবোধ। কাব্যের ভাষা ও কাঠামো নিয়ে কবির ভাবনা ক্রমশ পরিণতি পেয়েছে। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতা অনুধাবনের জন্য এই পরির্তনের ধারা অনুধাবন গুরুত্বপূর্ণ।

বি. দ্র. এই প্রবন্ধে হিমেল বরকত সম্পাদিত *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচনাবলী* ১ থেকে কবিতার পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

টীকা

১. সত্তরের দশকের কবিদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বেশিরভাগ সমালোচকই তাঁদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেছেন। যেমন– 'তাঁদের কবিতায় দেশ আছে, মানুষ আছে, গণ-সম্পৃক্তিও আছে; কিন্তু চিন্তনের সুস্থিত স্বয়ম্ভর প্রকাশ নেই; প্রগতি ও মানবিকতার পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান সত্ত্বেও দার্শনিক ভিত্তির অন্তর্বয়নে এ-পর্বের কবিরা নিবিষ্ট থাকেননি। ফলত কবিতা পূর্বজের আবর্তে নতুন স্বরের অনুসন্ধান করেছে, বৃত্ত-অতিক্রমী হয়নি।' (বায়তুল্লাহ্, ২০১৮ : ১৭৭)

২. কবি নিজেই এ-ব্যাপারে স্বীকারোক্তি করেছেন তাঁর 'সাহিত্যচিন্তা' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে।

৩. ভীষ্মদেব চৌধুরী কাব্যটির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'অক্ষরবৃত্ত ছন্দে গ্রথিত বিংশতি চরণের বত্রিশটি কবিতার এ সংকলন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর নিরীক্ষা-নিষ্ঠার বিরল দৃষ্টান্ত। শ্রম, উৎসব আর প্রশান্তির স্বাপ্নিক-রূপে রুদ্র শিল্পী এস.এম. সুলতানের ছবির নারী-পুরুষের পেশীসমৃদ্ধ স্বাস্থ্যকে শ্রমজীবী-কৃষিজীবী সমকালীন মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা করেছেন, প্রতীকী ব্যঞ্জনায় আকাঙ্ক্ষা করেছেন স্বাস্থ্যবান পৌরুষদীপ্ত ঐতিহ্যের পুনরোভ্যুদয়। *মানুষের মানচিত্র* পর্যায়ের কবিতাগুচ্ছে বাংলা কথ্য-ক্রিয়াপদ অবিকৃত রেখে দক্ষিণ বাংলার লোকায়ত-জীবন শব্দের মিশ্রণে খণ্ড খণ্ড গাঁথাধর্মী কবিতায় মানুষের যে অখণ্ড মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে আঙ্গিক-নিরীক্ষার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কবিতায় অভিব্যঞ্জিত হয়েছে অবিমিশ্র কাব্য-মাধুর্য।' (ভীষ্মদেব, ২০১৫ : ৩৯৫-৩৯৬)

৪. এই গ্রন্থটির আলোচনা করতে গিয়ে খোন্দকার আশরাফ হোসেন শুরুতেই মন্তব্য করে বলেছিলেন, ''রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ'র কাব্যগ্রন্থ 'মানুষের মানচিত্র' 'নব্য জসীমীয়' কাব্যভাষা ব্যবহারের সাম্প্রতিকতম উদাহরণ।" (খোন্দকার, ১৯৯৪ : ১৯১)

৫. এক সাক্ষাতকারে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বলেছিলেন, 'মেয়েটির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম-নীতির প্রতি অবজ্ঞা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, সে আমারই মতো মানস-

গঠনের। কিন্তু বাস্তবের ক্ষেত্রে এসে দেখলাম তার ভেতরে এক গোঁড়া, সংকীর্ণ রমণীর বসবাস। এবং সে তার মতো করেই আমাকে গড়ে নিতে চায়। তো সংঘাত অনিবার্য।' (হিমেল, ২০১২ : ৪০৬)

৬. মহসীন আলী তাঁর '*মানুষের মানচিত্র* কাব্যে লোকজ অনুষঙ্গ' প্রবন্ধে এ-বিষয়ে কথা বলেছেন। প্রবন্ধটি হিমেল বরকত সম্পাদিত *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ স্মারকগ্রন্থে* সংকলিত হয়েছে।

তথ্যপঞ্জি

আহমদ রফিক (২০১৫)। 'রুদ্রের প্রতিবাদী কবিতা : সমষ্টিবোধে উচ্চারিত কবিতা প্রসঙ্গ', *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ* [সম্পা. হিমেল বরকত], অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩০৭–৩১২

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৯৪)। *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

তপন বাগচী (১৯৯৮)। *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ* (জীবনীগ্রন্থ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

তসলিমা নাসরিন (২০১৫)। 'রুদ্র ফিরে আসুক', *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ* [সম্পা. হিমেল বরকত], অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২২৩–২২৬

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (২০১৮)। *কবিতার শব্দ-সাঁকো*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল, ঢাকা

বেগম আকতার কামাল (২০১৫)। 'রুদ্রর কবিতা : উচ্চারণ থেকে কথনে', *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ* [সম্পা. হিমেল বরকত], অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩২২–৩২৬

ভীষ্মদেব চৌধুরী (২০১৫)। 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ : কবিতা পাঠের ভূমিকা', *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ* [সম্পা. হিমেল বরকত], অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৯৩–৩৯৭

মাসুদুল হক (২০১৫)। 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ : নান্দনিক শিল্পী', *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ* [সম্পা. হিমেল বরকত], অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৪১০–৪১৪

মোস্তফা তারিকুল আহসান (২০০৮)। *বাংলাদেশের কবিতা : উপলব্ধির উচ্চারণ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান (২০০২)। *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ [ক] (চতুর্থ মুদ্রণ ২০১২)। 'অন্যান্য গদ্য'। *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচনাবলী* ১ [সম্পা. হিমেল বরকত], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৩৭৩–৩৭৭

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ [খ] (চতুর্থ মুদ্রণ ২০১২)। "'নব্য জসীমিজম' ও বহমান লোককাব্যধারা", *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচনাবলী* ১ [সম্পা. হিমেল বরকত], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। পৃ. ৩৫৩–৩৫৬

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ [গ] (চতুর্থ মুদ্রণ ২০১২)। 'গ্রন্থ ও রচনাপরিচয়', *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচনাবলী* ১ [সম্পা. হিমেল বরকত], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৪৮৫–৫০৫

শহীদ ইকবাল (দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৫)। *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (২০১৫)। 'মানুষ ও মানচিত্র : রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ', *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ* [সম্পা. হিমেল বরকত], অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৩১–৩৩৪

হিমেল বরকত [সম্পা.] (চতুর্থ মুদ্রণ ২০১২)। *রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচনাবলী* ১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা